ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

শহীদ কাদরীর কবিতা: প্রকৃতি ও লোকজীবন

*ফরিদা ইয়াসমিন

সারসংক্ষেপ: অনুসন্ধিৎসু কবি শহীদ কাদরী। বহুমাত্রিক এই কবির কাব্যকে প্রধানত দুটি পর্বে ভাগ করা য়ায়। প্রথম পর্বে তিনি সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে– এদের মধ্য দিয়ে এলিয়ট এবং বোদলেয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যা তাঁর কবিতায় প্রচ্ছন্ন ছায়াপাত ঘটেছে বিষয় ও বোধ বিচারে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতায় স্বদেশ-স্বজন, গ্রাম-গ্রামজ প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। কবিতা ও জীবন, জীবন ও প্রকৃতি এবং প্রকৃতি ও তার বিভিন্ন অনুষঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক অনন্তকাল ধরে– যা অলিখিত। আর এ তিনের মিথস্ক্রিয়ায় জীবনবোধের সৃষ্টি। কিন্তু প্রকৃতি-প্রতিবেশের ভিন্নতার কারণে ব্যক্তির জীবনবোধেরও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যা একজন মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে। এ দিক থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সত্তা বা বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাকে অন্যদের থেকে পৃথক রাখে। ফলে তার ভাবনা, নিজস্বতা এবং দৃষ্টিকেও ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত করে। ষাটের দশকের এমনই একজন স্বতন্ত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কবি শহীদ কাদরী। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের কবিতার বিষয়-আশয়, বিশেষ করে প্রকৃতি ও লোকজীবন কীভাবে তার কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা

নাগরিক চৈতন্যে লালিত কবি শহীদ কাদরী। নাগরিক পরিভাষা তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শহরের প্রতিটি অলি-গলি চষে বেড়িয়ে আবিষ্কারোৎসাহী কবি প্রকৃতির মাঝে মানবপ্রেমকে আবিষ্কার করে প্রকৃতি ও মানব প্রেমকে একই সত্তায় বিলীন করতে চেয়েছেন এবং তা উদ্ভাসিত করেছেন কবিতার নির্মাণশৈলীতে। কবিকে শুধু নাগরিক কবির ফ্রেমে আটকে রেখে তাঁর অসীমতাকে সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন হবে না। আর তাই বর্তমান প্রবন্ধে কবি শহীদ কাদরীর কবিতায় প্রকৃতি ও লোকজীবনকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে, তার স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বহুমাত্রিক কবি শহীদ কাদরীকে নাগরিক কবি বা আধুনিক কবি হিসেবেই খ্যাত করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি আমরা। কিন্তু তাঁর কবিতাগুলো পাঠ করলে দেখা যায় অধিকাংশ কবিতার পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রকৃতি ও লোকজীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ। আর এ উদ্দেশ্যেই কবিকে আরো জানার বা বোঝার আগ্রহ থেকে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অবতারণা।

শহীদ কাদরীর কবিতায় প্রকৃতি ও লোকজীবনের রূপায়ণ

যান্ত্রিক জীবনের জটিলতা কবিকে হাঁপিয়ে তুলেছিল। কবি উপলব্ধি করেছিলেন এ ব্যস্ততম শহরে কবির দিকে তাকানোর এতটুকু অবসর কারো নেই। তারা সবাই ঘর গোছাতে, তৈজসপত্রের রং, টেবিল-চেয়ারের ঢং, জানালার পর্দা ইত্যাদি বদলাতে আর গোছগাছ করতে বড্ড ব্যস্ত। আর তাইতো তঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে প্রকৃতির কোলে ফেরার আর্তি:

> ক্বচিৎ কখনো খুব কাছ থেকে তামাদের প্রচণ্ডব্যস্ততা আমি দেখি,
> দিগন্ত আঁধার-করা সজল শ্রাবণও বৃষ্টি ঝরানোর জন্য

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা উইমেন কলেজ, উত্তরা, ঢাকা

অমন ব্যস্ত নয়,
তাক-করা রাইফেলের অমোঘ রেঞ্জ থেকে উড়ে পালানোর জন্য
হরিয়ালের ঝাঁকও অমন ব্যস্ত নয়,
কর্কট- রোগীর দেহে ক্যান্সারের কোষগুলো ছড়িয়ে পড়ার জন্য
অমন ব্যস্ত নয়
... ...
তোমরা ব্যস্ত, বড্ড বেশি ব্যস্ত
অথচ আমি তো আজীবন তোমাদেরই দিকে যেতে চাই।[১]

কবি যেতে চান, কেন যেতে চান সে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। যদিও রুগ্ন শহুরে জীবনে কবি ক্লান্ত প্রকৃতিকে আপন করে পেতে চান কবি। শহুরেজীবনে লালিত কবি গ্রাম্যপ্রকৃতি ছিল দৃষ্টিসীমার বাইরে। আর সেজন্য যখন কবি নদীর পাড়ে ক্ষেতের মধ্যে দেখতে পান সর্ষে আর মটরশুটি তখন তিনি মুগ্ধ হয়েছেন অথবা দেখেছেন কোনো নারী ছিপ হাতে নৌকাতে বসে আছে, দ্বান্দ্বিক কবি সেখানেই ছুটে যেতে চেয়েছেন। বিমুগ্ধ কবি:

তুমি ছিপ হাতে নৌকাতে ব'সে আছো
নদীর অন্যপারে সর্ষে ও মটরশুটির মুখ
আমি কখনো দেখিনি,

আমি কোনদিকে যাবো-দুই দিকেই প্রবল টান
আমার; হ্যাঁ, এই চিরকাল
এমনটাই হ'লো
এমনিক'রেই ডাঙার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে আমার বসবাস
কোনোদিনও হ'লো না,
তরমুজ ক্ষেতের ওপারে আমার কোনো আটচালা নেই
অথচ দু'ধারে আছে সারি-সারি
হীরার পাতের মতো জ্ব'লে- ওঠা তোমাদের নিজস্ব
করোগেট, টোম্যাটোর লাল![২]

এই কবিতাটিতে দেখা যায় কবির প্রকৃতি অভিমুখী যে বাসনা তাকে আরো তীব্রতর করে তুলেছে। পুরো কবিতাটিতে যেমন দার্শনিক ভাবনা রয়েছে তেমনি বাহ্যিক ভাবনাও শক্তিশালী। দুই দিকেই কবির প্রবল টান একদিকে নাগরিক কবির নগরকে প্রত্যাখ্যান করে নিসর্গে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলেও দ্বন্দ্ব তাকে তাড়িত করে। এই স্বভাবসুলভ দ্বান্দ্বিক বোধই তাঁর কবিতা। এ বোধ এবং ভাবনা একান্তই কবিমনের। কিন্তু এ দ্বান্দ্বিক ভাবনা থেকে সহজেই অনুমেয় কবির প্রকৃতিপ্রীতি আর লোকজীবনের প্রতি কবি কতটা অনুরক্ত এবং কতটা গভীরভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ। কবিতার মাঝে দেখা যায় প্রকৃতিতে একদিকে নদী অন্য পারে সর্ষে আর মটরশুটির মুখ, এমন মায়াময় কোমল চিত্রকল্পের মধ্যে লুকিয়ে আছে আবেদনময়ী ভাষা যা স্নিগ্ধ ও নান্দনিক। সর্ষে আর বেলেমাটির মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা মটরশুটির যে সৌন্দর্য, তা গোচরীভূত হয় কবিদৃষ্টিতে। অর্থাৎ প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যে অনুষঙ্গ তা শহীদ কাদরীর কবিতার মধ্যে পরিস্ফুটিত হয়েছে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে।

শহীদ কাদরী মানবিক প্রেমের পাশাপাশি প্রকৃতি প্রেমকে তাঁর তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিতে সমানভাবে তুলে ধরেছেন। দেখা যায় একদিকে সর্ষে মটরশুটির ওপর যেমন প্রবল আকর্ষণ অন্যদিকে ছিপ হাতে বসে থাকা একটি নারী তার প্রতিও প্রবল আকর্ষণ। প্রকৃতির মাঝে তিনি নারীকে আবিষ্কার করে প্রকৃতিকে আরো নান্দনিক ও মোহনীয় করে তুলেছেন। প্রকৃতির মধ্যে যে নারীমুখ কিংবা শরীরী চিত্রকল্প আবিষ্কার করেছেন সেখানে কবি তাঁর প্রেমিকাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন। ছিপ হাতে নারী যেভাবে তাকে আকর্ষণ করে তেমনি 'তরমুজের ক্ষেত', 'টোম্যাটোর লাল' আবির তাঁকে প্রবলভাবে আসক্ত করে। দুটি সত্তা কবির কবিসত্তাকে প্রবলভাবে দ্বিধান্বিত করে। কোনটিকে গ্রহণ করবেন, তা নিয়ে সংশয়ও যেন একজন কবির জন্য পরম আনন্দের। আবার কখনও বা স্রোতের টানে 'একাকী খেলাচ্ছলে' নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন মাঝ নদীতে কোন কিনারায় যাবেন তাও ভাবনায় ফেলেছে কবিকে। তবে সব কিছু ছাপিয়ে তাদের কাছে আসতে না পারার যে আক্ষেপ যে হাহাকার তা কবি হৃদয়কে ব্যথিত করে, যন্ত্রণা দেয়, যে-কোনো বোধ সম্পন্ন সত্তাকে আঘাত দেবে, কবিও আঘাত পেয়েছেন। ছিপ হাতে নারী, সর্ষে ও মটরশুঁটি এবং টমেটোর রক্তিমতা এই ত্রিমুখী প্রেমের যে আবহ, তা কবির প্রকৃতি প্রেমেরই এক ভিন্ন রূপ যা শাশ্বত; চিরন্তন। টমেটোরলাল রঙে মন রাঙাতে না পারার যে বেদনা তা বাতাসে বাতাসে নদীস্রোতে পরিবাহিত হয়ে আরো বহুদূরে বাহিত হয়। নাগরিক কবি অভিধায় অভিহিত কবি নগরজীবনের যান্ত্রিকতাকে পাশ কাটিয়ে প্রকৃতির কোলে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছেন সযত্নে। জীবনবোধের গভীরতায় প্রকৃতির বসবাস ছিল নিরবচ্ছিন্ন। কোনোভাবেই প্রকৃতি থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারেননি। প্রকৃতির মায়াবি হাতছানি তাকে বিহ্বল করে তুলেছে বারবার:

এ-ভাবে জলে-জলে-জলে
জল থেকে জলে কতক্ষণ
হে পানসি হে ডিঙি-নৌকা হে যাত্রবাহী লঞ্চ
আমাকে কি দেখতে পাচ্ছো না?[৩]

একজন কবির কবিমানস বোঝা যায় তাঁর নিসর্গজাত অনুভূতি থেকে। রোমান্টিক কবিদের চোখে প্রকৃতি যে রূপ রস নিয়ে ধরা দেয় আধুনিক কবিদের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটে না। তেমনই একজন আধুনিক কবি শহীদ কাদরী যাঁর কাছে প্রকৃতি কেবল গাছ-পালা-নদী-পাহাড়-পর্বতবেষ্টিত পরিপার্শ্ব নয়, মানুষ এবং তার অস্তিত্ব মিলিয়ে জীবনের সমগ্র রূপই তার প্রকৃতি। যদিও কবির আজন্ম অবস্থান নগরে এবং নগরে লালিত কবি, তা সত্ত্বেও প্রকৃতির মধ্যে তাঁর যে প্রবল টান রয়েছে অধিকাংশ কবিতাই তার দৃষ্টান্ত বহন করে। যেহেতু গ্রাম-বিজড়িত আমাদের নগর, সে কারণে গ্রামের মানুষের জীবনাচার অর্থাৎ লোকজীবন এবং প্রকৃতি তাঁর দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়নি। পাশ্চাত্য রুচিবোধসম্পন্ন শহীদ কাদরী অভিজ্ঞতার ভূগোলকে কখনো অতিক্রম করেননি বা গ্রামীণ নস্টালজিয়া থেকেও তিনি পলায়ন করেননি। এখানেই তাঁর সার্থকতা। *মৃত্যুর পরে* এবং *নিসর্গে নুন* কবিতা দু'টি তারই জ্বলন্ত উদহরণ:

রয়ে যাই ঐ গুল্মলতায়,
পরিত্যক্ত হাওয়ায়–ওড়ানো কোন হলুদ পাতায়[৪]

কিংবা,

আমিও সশব্দে নিসর্গের কড়া নেড়ে দেখেছিলাম
পুকুর পাড়ের ঝোপে চুপি চুপি
ডাকাত-পড়ার ভয়ে স্পন্দমান নিঃশ্বসিত জল
কুলুপ লাগানো তার নড়বড়ে নষ্ট জানালায়[৫]

অন্য অনেক কবিদের মতো প্রকৃতিভাবনা শহীদ কাদরীর কবিতায় খুব সরলীকরণভাবে আসেনি। তিনি আপাত সৌন্দর্যের আড়ালে প্রকৃতির ভয়াবহতাকে খুব নিপুণ চোখে পর্যক্ষেণ করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যান্ত্রিকতা ব্যক্তি মানসকে প্রতিনিয়ত গ্রাস করে ফেলছে, মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। 'মানুষের সংবেদনা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতে ক্রমশবিকারহীনতায় পর্যবসিত হয়'।[৬] আর এই নির্বিকারত্ব অসংবেদনশীলতা ক্রমশ প্রসারিত হয় 'প্রকৃতি ও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে–হত্যা, মৃত্যু, লয় কোনো কিছুতেই কম্পিত বা দ্বিধান্বিত হয় না মানুষের সংবিৎ'।[৭] সুন্দরী গ্রাম্যবধূটি প্রকৃতির মতোই সহজ সরল হলেও অনায়াসে চিকন বটিতে একটি মাছের জীবনাবসান ঘটিয়ে ফেলে অথচ এই হত্যাকাণ্ডে গ্রাম্য বধূটির কোনো অনুশোচনা হয় না, এমনকি কোনো কান্নাও তৈরি হয় না। এই নির্বিকারত্ব কবিকে ব্যথিত করে:

একটি মাছের অবসান ঘটে চিকন বটিতে,
রাত্রির উঠোনে তার আঁশ জ্যোৎস্নার মতো
হেলায়-ফেলায় পড়ে থাকে
কোথাও কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না,
কোথাও কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না;[৮]

অথবা কবি দেখতে পান সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য একটি সবুজ টিয়া পাখিকে কিভাবে নিতান্ত অবহেলায় ব্যবহার করা হয়েছে:

মৃতের চোখের কোটরের মধ্যে লালঠোঁট নিঃশব্দে ডুবিয়ে বসে আছে
একটা সবুজ টিয়ে[৯]

কবি অবলোকন করেন একটি খরগোশ শিকার করে কিভাবে অতি আনন্দে তা ভক্ষণ করে:

সরল গ্রাম্যজন খরগোশ শিকার ক'রে নিপুণ ফিরে আসে
পত্নীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, চুল্লির লাল তাপে
একটি নরম শিশু খরগোশের মাংস দেখে আহ্লাদে লাফায়[১০]

গ্রাম্য উপাদান উপকরণগুলো ব্যক্তি মানুষ তার আনন্দদানের সামগ্রী মনে করে। চিত্তরঞ্জনের জন্য ব্যবহার করে তৃপ্তি মোটানোর জন্য ভোগ করে। যেমন একটি গোলাপ কিংবা একটি টিয়া পাখিকে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য কাজে লাগায় অবজ্ঞায়, তুচ্ছতায়। নগরে বেড়ে ওঠা কবি শহীদ কাদরী খুব সাধ করে গ্রামে যান। সেখানে এই সব দৃশ্য দেখে ব্যথিত হয়েছেন। 'মানবিক সংকট ব্যক্তিকেন্দ্রিক কবিকে এইভাবে বারবার করে তোলে নৈর্ব্যক্তিক'।[১১] কিন্তু কবি 'নির্বিকারিত্বের পরিবর্তে প্রতিনিয়ত সংবেদনার এই টানাপোড়েন কবি আকাঙ্ক্ষা করেন। জীবন ও সমাজে, গ্রামে ও শহরে সর্বত্র যান্ত্রিক-মানসের পরিবর্তে এই সংবেদনার সক্রিয়তা/ সচলতা কবির কাম্য'।[১২] কবি প্রত্যক্ষ করেন এখনো সংবেদনা বিলুপ্ত হয়নি আর এ কারণেই বৃক্ষ, পাখি, নেউলে, কুকুর বিষকাটালির ঝোপ, ল্যাংটো ছেলেদের সাতাঁর কাটা, বকুলফুল নিয়ে

কিশোরীর চলা প্রকৃতির এই দৃশ্যগুলো কবি মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। ভরিয়ে দেয় প্রেমে। সাইক্লোনের খবর কবিকে বিপর্যস্ত করে, হরিৎ ঘাসের রেখা ধরে হেটে চলা, ধূধূ মরাগ্রাম, ধানক্ষেত, পাতাঝরা গাছ, চাষার বউয়ের বোবাচাহনি, মরা নদী-বিল সব কিছু কবিকে বারবার মনে করিয়ে দেয় আবহমান গ্রামবাংলার কথা। প্রকৃতির প্রতি কবির যে মমত্ববোধ তা সহজেই বোঝা যায় তার কবিতায়:

হরিৎ ঘাসের রেখা ধরে ধরে,
লঘু পায়ে পায়ে,
পার হয়ে গেছি কত গ্রাম।
বাংলার গ্রাম, ধূ ধূ মরা গ্রাম;
মরা ধানখেত, পাতাঝরা গাছ;
চাষার বউয়ের বোবা চাহনি,
মরা নদী-বিল, স্বর্গশিশুর হাসি খিল খিল...
কত শুনলাম! কত দেখলাম![১৩]

কিংবা,

পাতার আড়ালে একচোট
দেখলাম পাখিদের নড়াচড়া (স্বীকার করছি মন্দ, হ্যাঁ নেহাৎ মন্দ নয়)
কাপড়শুকোতে দেয়া তারে
কিছু দোল- খাওয়া ফিঙে? ছিল বৈকি, তা-ও ছিল
সারাক্ষণই ছিল; তাছাড়া পুরোনো বটগাছ
ভাঙা দেউল, নেউল, একটি উল্টানো নৌকা এবং জলৌকা[১৪]

কবি খুব সাধ করে পল্লি ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি শখের বশে পাখিও স্বীকার করেছেন। কিন্তু তা গলধঃকরণ করতে পারেননি। কারণ অবচেতন মনে অপরাধবোধ জাগ্রত হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে নিসর্গে মুক্ত বিচরণশীল এই পাখি হত্যা জঘন্য অপরাধ। তাই রাতে ঘুমানোর সময় টিনে টুপটাপ শিশিরের শব্দ শুনে তার মনে হয়েছিল:

কে যেন কার গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়েছে, তার শেষ
রক্তবিন্দু পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়'।[১৫]

এভাবে কবির,

স্বপ্নের মধ্যে জ'মে উঠেছিল মরা পাখিদের স্তূপ!
এলোমেলো অসংখ্য পালক!'[১৬]

কবি মনে করেন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে গৃহহারা যে সব মানুষের উপর ছাদ বা চাল নেই সেসব উন্মুল মানুষেরাই সত্যিকারের নিসর্গের আত্মীয়। পল্লি প্রকৃতির সাথে তাদেরই আত্মার আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাইতো আকাশ জ্যোৎস্না, শিশির, কুয়াশা সব কিছুই তাদের কাছে বিশেষ রূপে ধরা দেয়। নিসর্গের মাঝেই খুঁজে পায় সব চাওয়া পাওয়া, আনন্দ-বেদনা। *একটি ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের জার্নাল* শীর্ষক কবিতার প্রথমাংশে (১২ নভেম্বর, ১৯৭০) পুরোটাই কবির নিসর্গ-সন্দর্শন।

তাই সে বেঁধেছে ঘর সন্ধ্যার পাখির স্বরে, চুপি চুপি চুরি করে ঢুকে গেছে শিশিরের টলটলে চুরি করে ঢুকে গেছে শিশিরের টলটলে ফোঁটার ভেতর জ্যোৎস্নাকে করোগেট শিট ভেবে প্রাণদাত্রী নদীর নিক্কণে[১৭]

শহীদ কাদরীর কবিতায় হা-ঘরে, গৃহহীন, উদ্বাস্তু, উন্মূল শব্দসমূহ বারবার আসে নানা কারণে ও প্রেক্ষাপটে। বিভিন্ন কারণে একাধিকবার ভিত্তিভূমি চ্যুত হওয়ার ফলে কবি নিজেকে তাদের দলভুক্ত মনে করেন। তাদের সাথে কবির যেন একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাদের নিসর্গের ভাবনার সাথে কবির নিসর্গের ভাবনা যেন একাকার হয়ে গেছে।

রাত্রে গাছের পাতায় আর ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে
খুচরো পয়সার মতো ছড়ানো জ্যোৎস্নারাজি দেখে
ভিক্ষুকের মতো বারবার আমিও দাঁড়িয়েছি
হাতের রুক্ষ তালু প্রসারিত ক'রে।[১৮]

মূলত কবির সমস্ত অস্তিত্ব জুড়েই রয়েছে বাংলাদেশের প্রকৃতি। কবি শহীদ কাদরীকে আধুনিক নাগরিক কবি অভিধায় অভিহিত করা হলেও গ্রামীণ লোকজজীবনের প্রতি তাঁর আছে গভীর ভালোবাসা। লোকজীবন, লোকসংস্কৃতি বিভিন্ন অনুষঙ্গ হয়ে অবচেতন মনে ফিরে আসে বার বার। এবং সতেনভাবে তাঁর কবিতায় উপস্থাপিত করেছেন। অবচেতনজাত লোকজীবনের অনুষঙ্গ গুচ্ছ আর বিপন্ন নগরজীবন কবির অবচেতন মনকে আঘাত করেছে বারংবার। বিভিন্ন জিজ্ঞাসা কবির সামনে আসে এবং নিজেকে দ্বিধান্বিত করে তোলে। সকল দ্বিধার মধ্যেও লোকজীবনের কিছু শাশ্বত অনুষঙ্গ কবিকে অনিবার্য আকর্ষণে কবির উপলব্ধিকে জাগ্রত করে। জ্যোৎস্না, জোনাকি, শিউলি এই অনুষঙ্গগুলো কবির কবিতায় বার বার এসেছে। জ্যোৎস্না লোকজীবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রকাশে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু নগরজীবনে জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। সুউচ্চ অট্টালিকা, ঘনবসতি, অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য তাদের কাছে গৌণ, ম্লান। লোকপুরাণে প্রচলিত 'চন্দ্রের তিনটি অংশ তেজ, সুধা ও জ্যোৎস্না। এরমধ্যে জ্যোৎস্নার রয়েছে অনন্য ভূমিকা'।[১৯]

জ্যোৎস্নার জলজ্যান্ত রাত্রে
ঝলমলে প্রস্রাবের মতো জ্বলজ্বল করে না তো কেউ
না যৌবন, না স্বর্ণের জটিল জৌলুশ।[২০]

লোকপুরাণজনিত কারণে লোকজীবনের বিশ্বাস ও সংস্কারে জ্যোৎস্নার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যন্ত্রচালিত পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী সমাজে মানুষ যখন ক্লান্ত অবসন্ন তখন তারাও জ্যোৎস্নার আলোতে নিজেকে স্নাত করিয়ে আনন্দ উপভোগ করে। এ থেকে কবিও নিজেকে আলাদা করতে পারেননি। তিনিও অবচেতন মনে নিজের শূন্যতাকে জ্যোৎস্নার আলোয় পরিপূর্ণ করতে চেয়েছেন। তা কবির কৈশোরে, যৌবনে, যুদ্ধে, এমনকি 'আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে' বার বার ফিরে আসে জ্যোৎস্নাঃ

একবার পেয়েছিলাম দূরাবাল্যকালে, কৈশোরে
রাস্তার ফাটলে কিছু তরল জ্যোৎস্না
সেই থেকে সমস্ত যৌবন অবধি, এমনকি গত যুদ্ধে
ব্ল্যাক-আউটের ট্রেকেও সন্ত্রস্ত স্মৃতির ভিতরে ছিলো
আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে জ্যোৎস্নার জান্তব জাগরণ[২১]

চাঁদের উন্মুক্ত ও পরিপূর্ণ সৌন্দর্য কেবল লোকপ্রকৃতিতেই ধরা পড়ে। জ্যোৎস্নার মতো চাঁদও লোকপ্রকৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় মূর্ত। কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে পরিস্ফুটনের জন্য চাঁদের সৌন্দর্যকে অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এভাবে কবি তাঁর কবিতায় লোকভাবনাকে উন্মোচন করেন:

এবং বাউলের একতারার মতো বেজে ওঠে চাঁদ[২২]

লোকজীবনকে শহীদ কাদরীর কবিতায় নানাভাবে চিত্রায়িত করেছেন:

এসো, আমরা দু'জন ঝাঁপ ঝাঁপ দিয়ে পড়ি
কোনো এক গ্রীষ্মের জোনাক-জ্বলা রাত্রে চমৎকার হাওয়ায়![২৩]

শিউলি ফুল প্রকৃতি ও লোকজীবনের ঐতিহ্যের ধারক বাহক। শহীদ কাদরীর কবিতায়ও শিউলি ফুল লোক-জীবনের প্রতীক হয়ে ধরা পড়েছে, অতীত অভিজ্ঞতাকে প্রত্যাবর্তন করেন তার কবিতায়। কিশোর বয়সের সঙ্গে স্মৃতি হয়ে যুক্ত হয় শিউলি ফুলের দৃশ্য।

কবে ঝরেছিল কাদের আঙিনায়
নওল-কিশোর ছেলেবেলার গন্ধ মনে আছে?[২৪]

দীর্ঘদিন নগরে বসবাস করার ফলে নগর জীবনের সঙ্গে কবি নিজেকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছেন। কবি চাইলেও নিজেকে লোকজীবনে ফিরিয়ে নিতে পারেন না, আবার লোকজীবনের ঐতিহ্যগুলো ভুলতে পারেন না। মায়ের আঙুল ধরে শিউলি ফুল তুলে আনা, স্বপ্নের মধ্যে কবি শিউলি গাছের সঙ্গে তার ব্যক্তি মাকে প্রত্যক্ষ করেন এবং শিউলিকে দিয়ে নগর জীবনের সঙ্গে লোকজীবনের সেতু বন্ধন করতে চান, ব্যক্তি কবি নিজেকেও লোকজীবনের সাথে আত্মিক সংযোগ ঘটাতে চান:

চলো তাকে তুলে আনি, তবু বলো
আগে কেন আনি নাই? অথচ স্বপ্নের মধ্যে
শিউলি-গাছের মতো আমার মা দারুণ সুগন্ধ
সঙ্গে নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে টান দেন কনিষ্ঠ আঙ্গুল।[২৫]

বস্তুনির্ভর জীবন থেকে কবি গ্রামে প্রত্যাবর্তন করতে চান। নিজেকে মুক্ত রাখতে চান প্রাণহীন নগর থেকে। প্রকৃতি কবির জীবনকে প্রাণিত করে, তাড়িত করে, তাই তার উচ্চারণ প্রত্যাবর্তনের দিকে:

চায়ের ধূসর কাপের মতো রেস্তোরাঁয়-রেস্তোরাঁয়
অনেক ঘুরলাম।
এই লোহা, তামা, পিতল ও পাথরের মধ্যে
আর কতদিন?
এখন তোমার সঙ্গে ক্ষেত খামার -দেখে বেড়াবো।
যারা গাঁও- গেরামের মানুষ
তাদের গ্রাম আছে, মসজিদ আছে
সেলাম-প্রণাম আছে।[২৬]

অতি সাধারণ একটি কাঠবেড়ালের কর্মদক্ষতা ও গতিময়তাও কবির চোখ এড়াতে পারেনি, মূলত এই গতিময়তায় মানুষের জীবনের উত্থান-পতনের দিকটি তুলে ধরেছেন। এখানে কবির

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির প্রতি যে গভীর বোধ তারই কোমল বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় তার কবিতায়। নিসর্গের কড়া নেড়ে কবি পুকুরপাড়ের ঝোপে আড় পেতে চুপি চুপি দেখেন ডাকাত পড়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত জলের কাঁপন। কবি ডাল বেয়ে দোতলার অবস্থান খোঁজেন। যেখানে কাঠবেড়ালের গতিতে তর তর করে উত্থানের দিকে ছুটে চলবেন।

কাঠবেড়ালও নই যে কর্মঠ গতিতে তরতর উঠে যাবো
যে-কোন গাছের দোতলায় কিম্বা
ডোরা-কাটা ভারী সাপের মতন প্রাকৃতিক আহার ফুরালে
আচমনহীন পালাবো গর্তের ঠাণ্ডা কামরাতে
রাত্রির আঁধারে ইন্দ্রনীল চোখ দুটো জ্বেলে কণ্ঠের গর্জনে
সুপক্ক ফলের মতো খসে পড়বে সন্ত্রস্ত বানর![২৭]

একটি মরা শালিক কবিতায় দেখা যায় প্রগাঢ় সবুজ লতাপাতার মধ্যে একটি *মরা হলুদ শালিক*, আবার সেই শালিককে কবি অবিভাবক হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। শহীদ কাদরী খুব সাধারণ অর্থে পশুপাখি, প্রকৃতি নিয়ে কবিতা লিখেননি। তার কবিতায় প্রকৃতি ও প্রকৃতির উপাদান প্রতীকী ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়েছে। প্রকৃতি আর পশুপাখির মধ্যে মানুষের যে গভীর সম্পর্ক সে চেতনার রূপায়ণই তার উদ্দেশ্য। কবিতায় এ রকম দার্শনিক জীবনবোধ কাদরীর কবিতাকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করে। গ্রাম, প্রকৃতি, লোকসংস্কৃতি, লোকজীবন, আচার অনুষ্ঠান কবিকে আকৃষ্ট করলেও নগরের প্রতি তিনি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন। তাই তিনি অবচেতন মনে ভাবেন ট্রেনভর্তি শিউলিফুল নিয়ে লোহা, তামা, পিতল দিয়ে তৈরি পাথররূপী দেশ তাকে গ্রহণ করবে কিনা। অবার কবির মননজগতে গ্রামের প্রতিও যে দুর্নিবার আকর্ষণ তাকেও অস্বীকার করতে পারেন না কবি। ঠাকুরমার ঝুলি প্রসঙ্গ যুক্ত করে তিনি লোকজীবনে ফিরে যেতে চান:

গলা পিচে তরল বুদ্বুদে ছল ছল নক্ষত্ররাজি,
তার ওপর কোমল পায়ের ছাপ,– চলে গেছি
শব্দহীন ঠাকুরমার ঝুলির ভেতর।[২৮]

গ্রামের ভেতর দিয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের নগর। তাই নগরজীবনের সাথে গ্রামীণ জীবনের গভীরতা প্রকট, ফলে নগর জীবন এখানে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি, হয়ে ওঠেনি স্বাবলম্বী। কবি শহীদ কাদরী সচেতনভাবে গ্রামকে প্রত্যাখান করলেও অবচেতন মনে কবি নিজেকে নিয়ে গেছেন মৃত্তিকালগ্ন জীবনের কাছে। জীবনের তাগিদে শহরে অবস্থান করলেও লোকজীবনের নানা সংস্কার-বিশ্বাসে আস্থা রাখতে চান কবি। অবচেতনে ফিরতে চান লোকজীবনে। ফিরবার পথ কবির জানা নাই। আবার কবি এও প্রত্যক্ষ করেছেন গ্রামীণ ঐতিহ্য আগের মতো নেই। কালের বিবর্তনে গ্রামগুলো আর গ্রাম হয়ে ওঠতে পারেনি। কালের বিবর্তনে সব কিছু বিলীন হয়ে গেছে। যে লণ্ঠন লোকজীবনে রাতে পথ দেখানোর একমাত্র অবলম্বন ছিল এখন তা কবির কাছে 'মৃত হলুদ চোখের মতো দ্যুতিহীন'। জ্যোৎস্না রাতে ঠাকুমার ঝুলি আর রস আস্বাদন নিয়ে লোকজীবনে আসে না, নেই পরিদের আনাগোনা। সাধারণ মানুষের লোকধর্ম, লোকাচার বিলুপ্ত প্রায়। প্রার্থনালয়গুলোও নেমে গেছে খাদে। অন্যদিকে আধাসামন্তবাদী নগরও কবির কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। কবি আজ দ্বিধাহীন। কবি তার কবিতায় এই বিপন্ন অবস্থাকে চিত্রিত করেন এভাবে:

এখন আমি আর কোনোদিকেই যেতে পারছি না

সে কোন্ সকাল থেকে শুরু হয়েছে আমার অঙ্গভঙ্গি
আমার ডুব- সাঁতার, চিৎ সাতাঁর
উবু-সাতাঁর, মৃদু-সাঁতার, মরা- সাঁতার, বাঁচা-সাঁতার
হ্যাঁ, সত্যি। সাঁতার দিতে- দিতেই আমার যেন বয়োবৃদ্ধি হ'লো।
জলের ওপর আমার কৈশোর, আমার যৌবন
কচুরিপানার মতো ভাসে
বেড়াচ্ছে কী দারুণ সুবজ ![২৯]

শহীদ কাদরীর নিসর্গচেতনা সম্পর্কে রফিকউল্লাহ খানের মূল্যায়ন এমন:

> শহীদ কাদরীর কাব্যবস্তুর অভিনবত্ব এখানে যে গ্রামীণ অভিজ্ঞতার কোনো পিছুটান, নিসর্গের অনুভূমিকতায় বিচরণশীলস্মৃতিলোক তাঁর ব্যক্তিগত অভিধানে অনুপস্থিত। ফলে 'ফেরা' নামক রোম্যান্টিক পলায়নেরও কোনো সুযোগ থাকে না তাঁর সামনে।[৩০]

বিপন্ন, ক্ষয়িষ্ণু নগরের অপরিছন্ন একঘেঁয়ে জীবন থেকে সে অব্যাহতি চায়। প্রত্যাবর্তন করতে চায় গ্রামে। কিন্তু গ্রামগুলোও যে আগের মতো নেই আর তাই কবির ভেতরে জেগে ওঠে প্রত্যাবর্তনের ভীতি,'পরিচিত প্রকৃতিজগতের সান্নিধ্যজাত অনুভব থেকে যে শহীদ কাদরীর অনুভব ভিন্ন, তা স্বতঃসিদ্ধ। আর সে জন্যেই হয়তো চিরপরিচিত নগরকে প্রত্যাখান করে নিসর্গস্নাত হয়ে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গে তার মধ্যে জেগে ওঠে প্রত্যাখানের তীব্র ভীতি।'[৩১] এ প্রসঙ্গে আরেকটি অভিমত নেয়া যেতে পারে:

> নিসর্গের প্রতি বিরূপতা, এ উপাদান বোদলেয়ারের এবং নাগরিক জীবনের প্রকাশ, এ উপাদান বোদলেয়ার এবং এলিয়ট-এর চিন্তা থেকে আসা। অবশ্য কাদরী লিখেছেন বাংলায় এবং তার স্বকীয় ঝাঁঝালো ভাষাশৈলীতে, আর গ্রহণ অবশ্যই করা যায়। প্রথম, *উত্তরাধিকার*-এ আবহমান বাংলা কবিতার প্রকৃতি বন্দনায় রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের বিরুদ্ধে কাদরী কটাক্ষ করেছেন। 'নপুংসক সন্তের উক্তি', 'কবিতাই আরাধ্য আমার', 'সমকালীন জীবন দেবতার প্রতি' এবং 'নিসর্গের নুন' কবিতাগুলিতে এই প্রথম বোধটি তীক্ষ এবং কাদরীর বিদ্রুপে জর্জর। গ্রাম্যজন যে গান চায়, সে বিগত এবং তার পুনরুদ্ধারও অসম্ভব।'[৩২]

শহীদ কাদরী পাশ্চাত্য ভাবধারার কবি হলেও গ্রাম বিজড়িত নগরে তিনি খুঁজে পান লোক-ঐতিহ্যে আঘ্রাণ। তাঁর অভিজ্ঞতায়, স্মৃতিতে, অবচেতন মনে বারবার ফিরে আসে লোকজীবন-মিশ্রিত নানান অনুষঙ্গ:

> লোকজীবন সৃষ্টিশীলদের চেতনায় নানাভাবে প্রভাব ফেলে। কেউ আবেগসত্তার তাড়নায় লোকজীবনকে কাব্যভাবনায় সমীকৃত করেন। কেউ পাঠ-অভিজ্ঞতায় স্নাত হয়ে লোকজীবনের চিত্র অঙ্কন করেন; তাদের অবচেতনে ঐতিহ্যের উপমানচিত্র পৌনঃপুনিক আবহ নিয়ে ফিরে আসে। শহীদ কাদরী শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের কবি। লোকপ্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য জ্যোৎস্নার উপমানচিত্রে কবির অবচেতন মনে পুনরাবৃত্ত হয়।[৩৩]

শহীদ কাদরীর কবিতা থেকে পাঠ নেওয়া যেতে পারে:

একটি আংটির মতো তোমাকে পরেছি স্বদেশ
আমার কনিষ্ঠ আঙ্গুলে, কখনো উদ্ধত তলোয়ারের মতো
দীপ্তিমান ঘাসের বিস্তারে, দেখেছি তোমার ডোরাকাটা
জ্বলজ্বলে রূপ জ্যোৎস্নায়।[৩৪]

সোনালি পয়সার মতন দুই পকেট ভর্তি স্বপ্নের ঝনাৎকার
আর জ্যোৎস্নার চকিত ঝলক আমার
ঝলসানো মুখের অবয়বে[৩৫]

কবি শহীদ কাদরী সচেতনভাবে হতে চেয়েছেন নাগরিক কবি। তাই পাশ্চাত্য আবহকে ধারণ করে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু আবার একই সমান্তরালে তিনি লোকজীবনের অনুষঙ্গকে ধারণ করেছেন। তাইতো দ্বিধাহীন ছিলেন কবি। একদিকে অধঃপতিত অপরিপূর্ণ নাগরিকজীবন কবিকে করেছে বিপর্যস্ত বিপন্ন, তাই তিনি যে নগরের চিত্র রূপায়ণ করেন, তাই সঙ্গতভাবেই ক্ষয়িষ্ণু আধাসামন্ত নাগরিক জীবনভাষ্য। অন্যদিকে লোকজীবনে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলেও সেখানেও প্রত্যক্ষ করেন গ্রামীণ জীবন, সংস্কৃতি বিলুপ্ত প্রায়। আর তাইতো নিরন্তর দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়েই তার শিল্পীসত্তার বিকাশ সাধিত হয়েছিল। এ পর্যায়ে একটি কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে:

নিসর্গ সেদিন তার ছদ্মবেশ খুলেছিল
একে একে সব অলংকার সে
যেমন রাজর্ষি যুবা প্ররোচিত হবার পর
বিয়ের সোনালি খাট থেকে হঠাৎ সভয়ে দ্যাখে
রক্ত- মাংসভুক ডাইনী এক তার প্রিয় প্রাসাদ জুড়ে
নর্তনে-কুর্দনে মেতে সব গয়না পরিত্যাগ করেছে।
নিসর্গ আবার তার মোহন ছদ্মবেশ পরেছে।[৩৬]

শহীদ কাদরীর কবিতার পুরো অস্তিত্বই জুড়ে রয়েছে নেতিবাচকতা যার প্রভাব পড়েছে তাঁর নিসর্গজাত কবিতার মধ্যে। এ সম্বন্ধে সত্তরের দশকের কবি মাহবুব সাদিকের একটি মূল্যায়ন-প্রতিপাদ্য তুলে ধরা হলো:

> তিরিশোত্তর কবিদের কারো রচনায় লক্ষ করা যাবে, প্রকৃতিবিরোধ। এদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু অন্যতম। শহীদ কাদরীও প্রকৃতির প্রতি বেশ বিমুখ। প্রকৃতি কবিতার অন্যতম উপাদান। কবির চারপাশে জায়মান মানবগোষ্ঠির মতো তাকে ঘিরে আছে গ্রামীণ নাগরিক নিসর্গ। প্রকৃতির প্রবল প্রতিবেশিতার তাপ এমনকি স্বল্প সংবেদনশীলরাও উপলব্ধি করেন। কবির সংবেদনশীলতা তো সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি। প্রকৃতির প্রতি এই সংবেদনশীলতা অবশ্য বুদ্ধদেব ও শহীদ কাদরী দুজনের মধ্যেই আছে। চারপাশে পরিব্যাপ্ত পৃথিবী ও পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি থেকে কোনো মানুষই বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন না- তাঁরাও বিচ্ছিন্ন নন। তবে দুজনেই অন্ধ- আদিম পরিব্যাপ্ত বিশৃঙ্খল প্রাকৃতিক জীবনের বিরুদ্ধে নিজস্ব চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটান এবং প্রাকৃতিক জীবনের বিরুদ্ধে নিজস্ব চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটান এবং প্রাকৃতিক বিশৃঙ্খলাকে অতিক্রম করে দুজনই সংহত ও সংযত কাব্যকলা সৃষ্টি করেন। বুদ্ধদেব লিখেছেন : গ্রামান্তরে কিছুই নেই;/ জানালায় পর্দা টেনে দে।'[৩৭]

প্রকৃতির মধ্যে যে নেতিবাচকতা তা কবির ব্যক্তিজীবনেরই ছায়াপাত ঘটেছে। *নিসর্গের নুন* কবিতাটি তারই বহিঃপ্রকাশ:

কেক্-পেস্ট্রির মতোন সাজানো থরে থরে নয়নাভিরাম
পুষ্পগুচ্ছের কাছেও গিয়েছি ত', ম্লান রেস্তোরাঁয়
বিবর্ণ কেবিনে আশ্রয়ের যে আশ্বাস এখনও

টেবিল ও চেয়ারের হিম-শূন্যতায় লেখা আছে
তেমন সাইনবোর্ড কোন জুঁই, চামেলি অথবা
চন্দ্রমল্লিকার ঝোপে- ঝাড়ে আমি ত' খুঁজেও পেলাম না।

ইচ্ছে ছিলো কেবল তোমার নুন খেয়ে আজীবন
গুণ গেয়ে যাবো
অথচ কদ্দিন পরে বারান্দা পেরিয়ে
দাঁড়িয়েছি ঝোপে
ধাঁরালো বটির মতো কোপ মেরে
কেন যে, কেন যে
দ্বিখণ্ডিত করছে না
এখনও সুতীক্ষ্ণ বাঁকা
ঐ বঙ্গদেশীয় চাঁদ![৩৮]

কবি শহীদ কাদরী নিসর্গের নুন খেয়ে আজীবন প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকে যেতে চেয়েছেন, কিন্তু পারেননি। কারণ নিসর্গের মধ্যেও কবি দেখতে পান অসঙ্গতি। সবাই যেখানে নিসর্গের নুন খেয়ে আমৃত্যু কাটিয়ে দিয়েছেন কবি সেখানে চিরচেনা প্রথার বাইরে গিয়ে বিপরীতে পথ হেঁটেছেন। প্রকৃতি, লোকজীবনের কোনো উপাদান উপকরণই কবিকে আটকে রাখতে পারেনি। তাই 'নিসর্গ প্রকৃতির মোহে জীবনানন্দ আজীবন বাংলায় থেকে যেতে চেয়েছিলেন। শহীদ কাদরীও চান, তবে নিসর্গপ্রেমিকের সুবাদে নয়।'[৩৯]

এই ধ্বংসস্তূপ স্পর্শ ক'রে আমরা কয়েকজন
আজীবন র'য়ে যাব বিদীর্ণ স্বদেশে, স্বজনের লাশের আশেপাশে।'[৪০]

কবি শহীদ কাদরী নিসর্গ এবং নগর এই দুয়ের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছেন দ্বিধান্বিত চিত্তে। রুগ্ন নাগরিক জীবনের প্রতি বীতরাগ হয়ে যখন তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন ভগ্ন নগরায়ণের চাকায় পিষ্ট হয়েছেন তখন কবি বকুলতলায় একটু বিশুদ্ধ স্নিগ্ধ বাতাসের আশায় ছুটে গিয়েছেন নিসর্গস্নাত গ্রামীণ পরিবেশে। দেখেছেন লোকজীবন প্রবাহ। লোকপ্রকৃতির অন্যতম উপাদান জোনাকিকে লোকজীবনের প্রাধান্য বৃদ্ধিতে কবিতায় আগমন ঘটিয়েছেন। *সোনালি জরির মতো* অগণিত জোনাকি প্রকৃতিকে আলোকিত করে দেয়। চিত্রকল্পটির মাধ্যমে কবি লোক-প্রকৃতিকে আরো বাঙ্ময় করে তুলেছেন। দেখেছেন জ্যোৎস্নার আলো যখন বাগানের ফুলগুলোর উপর ঢলে পড়েছে তখন ফুলগুলি কি অফুরন্ত সৌন্দর্য ছড়ায়, সোনালি জরির মতো জোনাকিরা নক্সা জ্বেলে দেয়, লোকপুরাণের গল্পের সেই অপ্সরাকে আবিষ্কার করেন নক্ষত্রের আলোক-জ্বলা জলে। তাই হয়তো, দ্বান্দ্বিক কবি কাদরী বিমুগ্ধচিত্তে বলেন:

জ্যোৎস্নায় বিব্রত বাগানের ফুলগুলি, অফুরন্ত
হাওয়ার আশ্চর্য আবিষ্কার করে নিয়ে
চোখের বিষাদ আমি বদ্‌লে নি' আর হতাশারে
নিঃশব্দে বিছিয়ে রাখি বকুলতলায়
সেখানে একাকী রাত্রে, বারান্দার পাশে
সোনালি জরির মতো জোনাকিরা নক্সা জ্বেলে দেবে,

টল টল করবে কেবল এই নক্ষত্রের আলো-জ্বলা জল
অপ্সরার ওষ্ঠ থেকে খসে-পড়া চুম্বনের মতো
তৃষ্ণা নেভানোর প্রতিশ্রুতিতে সজল
এই আটপৌরে পুকুরেই
শামুকে সাজাবে তার আজীবন প্রতীক্ষিত পাড়।

পরিত্যক্ত মূল্যবোধ, নতুন ফুলের কৌটাগুলো
জ্বলজ্বলে মনির মতন সংখ্যাহীন জ্যোৎস্না ভরে নিয়ে
নিঃশব্দে থাকবে ফুটে মধ্য-বিশ শতকের ক্লান্ত শিল্পের দিকে চেয়ে
– এইমতো নির্বোধ বিশ্বাস নিয়ে আমি
বসে আছি আজ রাত্রে বারান্দার হাতল- চেয়ারে
জ্যোৎস্নায় হাওয়ায়।[৪১]

কবি তার কবিতায় যেভাবে প্রকৃতি ও লোকজীবনের চিত্র এঁকেছেন তা অভিনব এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। একজন নাগরিক কবি যেভাবে অবচেতন মনে প্রকৃতি আর লোকজীবনকে ধারণ করেন অনায়াসে 'খুব সাধ ক'রে গিয়েছিলাম' কিংবা 'দাঁড়াও আমি আসছি' এর মত কবিতা লিখেছেন তা কখনোই তাকে নাগরিক কবির তকমায় অভিহিত করা ঠিক হবে না। এতে তাঁর কবিতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে না। কবির কিছু কবিতা পড়লে বোঝা যায় গ্রামে ফেরার তাগিদ তিনি প্রচণ্ডভাবে অনুভব করেছিলেন। নগরের কবি হয়েও প্রকৃতি ও লোকজীবনের প্রতি পুলকিত-তরঙ্গ তরঙ্গায়িত হয়েছে তাঁর হৃদয়ের গভীরে। শহীদ কাদরীর কবিতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনু হোসেন বলেন, 'শহীদ কাদরী ছিলেন আদ্যন্ত নাগরিক কবি। কবিতা নির্মাণের প্রকরণে পশ্চিমে শিল্পরীতির আশ্রয় গ্রহণ করলেও বিষয় নির্বাচনে তিনি সব সময়ই ছিলেন বাংলার মানুষ ও নিসর্গের প্রতি ভালোবাসায় ব্যাকুল'।[৪২]

নির্জনতা বিলাসী সৃষ্টিশীল লেখক কবি শহীদ কাদরী তার কবিতায় বিষয়বৈচিত্র্য এনে কবিতাকে করেছেন সমৃদ্ধ, নিয়ে গেছেন উচ্চতর শিখরে। আজন্ম নগরে লালিত কবি প্রকৃতি সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাঁর প্রকৃতি ও লোকজীবন ছিল গভীর জীবন-দর্শনেরই এক গুরুত্বপূর্ণ সারাৎসার। এতে সহজেই অনুমেয়, প্রকৃতিকে শহীদ কাদরী যেভাবেই প্রত্যক্ষ করুক না কেন প্রকৃতি ও লোকজীবন অনায়াসে জায়গা দখল করে নিয়েছেন তাঁর কবিতায়। শহীদ কাদরী তাঁর কবিতায় প্রকৃতি ও লোকজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুষঙ্গগুলো যেভাবে গভীর দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেছেন এবং যে-অনুভব-অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, তা বাংলা কাব্যে প্রায় বিরল।

উপসংহার

শহীদ কাদরী জীবনের বেশিরভাগ সময়টা কাটিয়েছেন শহর আর শহরকেন্দ্রিক অলিগলি চষে বেড়িয়ে। কিন্তু কবি যতই উদয়াস্ত শহর চষে বেড়াক, যান্ত্রিক জীবনের জটিলতাকে পাশ কাটিয়ে কবি ক্রমশ গ্রামীণ প্রকৃতি আর সহজ-সরল গ্রাম্য মানুষগুলোর লোকজ-জীবনের অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছেন অন্তঃকরণে। নিজেকে বিলীন করতে চেয়েছেন প্রকৃতির মাঝে। তবে শহীদ কাদরীর কবিতায় অন্যান্য কবির মতো প্রকৃতি খুব রোমান্টিক আবহে সরলভাবে

প্রতিভাত হয়নি। কারণ কবি খুব সাধ করে গ্রামে গিয়ে দেখেছেন প্রকৃতির মর্মমূলে গ্রথিত হয়েছে যান্ত্রিক জীবনের জটিলতা। নগরজীবনের বিষবাষ্প গ্রাম্যজীবন আর গ্রাম্য প্রকৃতিতেও পুঞ্জিভূত হয়েছে। তারপরেও রুগ্ন শহুরে জীবন থেকে প্রকৃতির শান্ত-শীতল আলিঙ্গন পেতে গ্রামের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। প্রকৃতিপ্রীতি-লোকজপ্রীতি যেভাবে কবির অসংখ্য কবিতায় উদ্ভাসিত হয়েছে, তা পাঠকের চেতনায়ও এক আলোকবিচ্ছুরণ বিভা তৈরি করে। তবে কবি গ্রামে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলেও এ-ও ভেবেছেন– যদি আবার নগরজীবনে ফিরে যাওয়ার বাসনা তাড়িত করে, তখন শহরের মানুষগুলো তাকে আর গ্রহণ করবে কি-না! তবে, সবকিছুকে ছাড়িয়ে দ্বিধান্বিত কবি, সংশয়ের দোলাচলে থেকেও, শৈশবে মায়ের হাত ধরে শিশির ভেজা শিউলি ফুল কুড়াতে যাওয়ার আনন্দকে নিজের স্মৃতিতে জাগ্রত রাখতেই ভালোবেসেছেন।

তথ্যসূচি:

---

১ শহীদ কাদরী, 'কেন যেতে চাই', *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক: মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৩), পৃ. ১১৭

২ শহীদ কাদরী, 'দাঁড়াও আমি আসছি', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

৩ শহীদ কাদরী, 'দাঁড়াও আমি আসছি', *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক: মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৩), পৃ. ১৭

৪ প্রাগুক্ত, 'মৃত্যুর পরে', পৃ. ২০

৫ শহীদ কাদরী, 'নিসর্গের নুন', *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক : মফিদুল হক, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৩), পৃ. ৪১

৬ তারানা নূপুর, 'শহীদ কাদরীর কবিতা: সময়, সংকট ও সংবেদনা', *উলুখাগড়া*, সম্পাদক: সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রকাশকাল, ২০০৬, পৃ. ১২২

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

৮ শহীদ কাদরী, 'কোনো ক্রন্দন তৈরী হয়না', *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক: মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৩), পৃ. ১৩৬

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

১১ তারানা নূপুর, 'শহীদ কাদরীর কবিতা: সময়, সংকট ও সংবেদনা', *উলুখাগড়া*, সম্পাদক: সৈয়দ আকরম হোসেন, ২০০৬, পৃ. ১২৪

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

১৩ শহীদ কাদরী, 'পরিক্রমা', *গোধূলির গান*, (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশনী, ২০১৭),পৃ. ২৭

১৪ শহীদ কাদরী,'খুব সাধ ক'রে গিয়েছিলাম', *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক: মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৩), পৃ. ১৫৪

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

১৬ শহীদ কাদরী, 'খুব সাধ ক'রে গিয়েছিলাম', *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক: মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্য

প্রকাশ ১৯৯৩), পৃ. ১৫৪
[১৭] শহীদ কাদরী, 'একটি ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের জার্নাল', *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক: মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৩), পৃ. ১৬২
[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
[১৯] অনু হোসেন, 'শুদ্ধতম রূপকল্পের যাত্রী শহীদ কাদরী', *শালুক*, সম্পাদক: ওবায়েদ আকাশ, (ঢাকা: সংখ্যা-২১, ২০১৬), পৃ. ১৮২
[২০] শহীদ কাদরী, 'বালকেরা জানে শুধু', *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক: মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ১৫৬
[২১] শহীদ কাদরী, 'একবার দূর বাল্যকালে', *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক: মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৩), পৃ. ১০৮
[২২] প্রাগুক্ত, 'জানালা থেকে', পৃ. ২৬
[২৩] প্রাগুক্ত, 'এক চমৎকার রাত্রে', পৃ. ১৪৫
[২৪] শহীদ কাদরী, 'বোধ', *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক : মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ১৬৭
[২৫] প্রাগুক্ত,'যাই যাই', পৃ. ১৫০
[২৬] শহীদ কাদরী, 'এবার আমি', *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক: মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ১৪৩
[২৭] শহীদ কাদরী, 'নিসর্গের নুন',*শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক: মফিদুল হক,(ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ৪১
[২৮] শহীদ কাদরী, 'স্মৃতি: কৈশোরিক',*শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক : মফিদুল হক, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৩), পৃ.২৫
[২৯] শহীদ কাদরী ,'দাঁড়াও আমি আসছি', *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক : মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৩), পৃ. ১৭৩
[৩০] রফিকউল্লাহ খান, 'শহীদ কাদরী', *সমবায়ী স্বতন্ত্রস্বর*, (ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০০২), পৃ. ১৫০
[৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১
[৩২] ওমর সামস্, 'শহীদ কাদরীর কবিতা', *সাহিত্য পত্রিকা*, (ঢাকা: arts bdnews24. com 2016)
[৩৩] অনু হোসেন, 'শুদ্ধতম রূপকল্পের যাত্রী' *শালুক*, সম্পাদক: ওবায়েদ আকাশ, (ঢাকা: সংখ্যা-২১ ডিসেম্বর, ২০১৮), পৃ. ১৮৪
[৩৪] শহীদ কাদরী, ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমায়' *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক: মফিদুল হক, (সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ৮৭
[৩৫] শহীদ কাদরী 'আমি কিছুই কিনবো না' *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক: মফিদুল হক, (সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ১৭
[৩৬] শহীদ কাদরী, 'একটি ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের জার্নাল', *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক: মফিদুল হক, (সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ১৬২
[৩৭] মাহবুব সাদিক, 'শহীদ কাদরীর কবিতা', *কালি ও কলম*, সম্পাদক আবুল হাসনাত, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০০৭, পৃ. ৮৭
[৩৮] শহীদ কাদরী, 'নিসর্গের নুন, *শহীদ কাদরীর কবিতা*', সম্পাদক: মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ৪১
[৩৯] সালাহ্উদ্দিন আহমেদ, 'জোছনালোকিত সরল উত্থান', *শহীদ কাদরী কবি ও কবিতা*, ইকবাল হাসান, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী ২০০৩), পৃ. ১৪৪
[৪০] শহীদ কাদরী, 'নিষিদ্ধ জর্নাল থেকে', *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক: মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশনী ১৯৯৩), পৃ. ৮২
[৪১] শহীদ কাদরী, 'নশ্বর জ্যোৎস্নায়', *শহীদ কাদরীর কবিতা*, সম্পাদক: মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ১৯
[৪২] অনু হোসেন, শহীদ কাদরী ছিলেন আদ্যন্ত নাগরিক কবি, *দৈনিক প্রথম আলো*, সম্পাদক: মতিউর রহমান, ২৯ আগস্ট, ২০১৬